উপসংহার

সিদ্ধান্ত ভাবনা :

ঊনবিংশ শতক হল ধর্মজাগরণের সময়। এই সময় ধর্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার করেন সমাজ সংস্কারকগণ। ধর্মজাগরণ ঘটেছিল মূলত অতীত ভারত সংস্কৃতির মধ্যে; যে জীবন দর্শন ছিল তার সংস্কার করেই সমাজ সংস্কারকগণ, ধর্মসংস্কারকগণ পুরোনো ঐতিহ্যের আধুনিক যুক্তি বিজ্ঞানের দ্বারা মানব সমাজের ধর্মজাগরণ ঘটালেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যথার্থ ভাবে প্রয়োজনীয় হল অমলেশ ত্রিপাঠী মহাশয়ের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। তিনি বলেছেন— ''আমাদের নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গ্রীক লাতিনের বদলে ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। তাও হয়েছিল অতীতে ফিরে যাবার রিভাইভ্যাসিষ্ট তাগিদে নয়, জীবনের নতুন দর্শন, নতুন চর্যা আবিষ্কারের জন্য।''[১] হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের মাটিতে আবির্ভূত হন। তিনিও সমাজ সংস্কার ধর্ম সংস্কারে ব্রতী হন। সংস্কারকামী হতে গিয়ে সকলেই অতীতের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন আধুনিক জ্ঞানালোকের দ্বারা। হরিচাঁদ ঠাকুরও অতীতের ঐতিহ্যের পুনরুত্থান ঘটান আধুনিক যুগে। তার ধর্ম ভাবনা হল 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' ভাবনার বিকাশ। যা মতুয়া ধর্ম নামে খ্যাত। হরিচাঁদ ঠাকুর যে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মাদর্শকে সংস্কার করেন তা আসলে সনাতন ধর্মাদর্শের মার্জিত রূপ। যে সনাতন ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল প্রাকঐতিহাসিক কালে। সেই পুরানো দর্শনেরই ধর্মজাগরণ ঘটালেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তগণকে নিয়ে নামসংকীর্ত্তন করতেন সেই সমাজ বাস্তবতাও ছিল দ্বন্দ্ব মুখরিত সমাজ। সেই সমাজ প্রেক্ষাপটেও কর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত না হয়ে আরো দৃঢ় ভাবে কর্ম প্রচেষ্টার বিস্তার ঘটালেন। সেই সময় হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবদর্শকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে দেশ থেকে দেশান্তরে ধর্মবার্তাকে ছড়িয়ে ছিয়েছেন যারা তাদের নাম উল্লেখ করা গেলেও যারা অলিখিত ভক্ত মানুষ ছিলেন তাদের ভূমিকাও ছিল ব্যাপক। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ ও সমাজ গঠনের কর্মাদর্শকে পাথেয় করে মানুষের জাগতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মকর্মাদর্শের দ্বারা আদর্শিত হয়ে তৎকালীন সময়ে যে সকল সমাজ কল্যাণকামী ভক্তগণ সমাজ সেবায়

নিজেদের আত্ম নিয়োগ করেছিলেন তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শের যে প্রসার তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় হয়েছিল তার প্রসারতা থাকলেও দেশ বিভাগ জনিত কারণে সেই প্রসারতা মহাসমুদ্রের মত বিস্তার লাভ করল।

১৮১২ সালে হরিচাঁদ ঠাকুরের থেকে মতুয়া ধর্ম বা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের নব প্রতিষ্ঠা হয়ে যে ধর্ম ধারার প্রসার ঘটেছে সমাজে তার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে একথা বলতে হয় যে হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের সমাজ জীবনে নবভাবে আত্মচৈতন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠা দিয়ে সমাজকে পূর্ণমানবতা বোধে জাগ্রত করেছেন। 'বাংলার নবজাগরণে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরও 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর' প্রবন্ধে ভবানী শংকর রায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের বাস্তব সমাজের সত্যিকারের ধর্ম-কর্মদর্শের মূল্যায়ন। তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরলাম—

> ''পৃথিবীতে কখনো এমন অনেক মহামানবের আবির্ভাব ঘটে, যাদের আবির্ভাবে পৃথিবীর গতিধারা মানব কল্যাণে ধাবিত হয়। এই কল্যাণের দ্বারা সূচিত হয় নব জাগরণ। উন্মোচিত হয় নতুন দিগন্ত। এই নবজাগরণের দ্বারা সৃষ্টি হয় এক নতুন সমাজ, এক নতুন সংস্কৃতি, তার আলোক প্রভা ছড়িয়ে পড়ে কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। এরকমই এক যুগ পুরুষ হলেন শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর। ... শ্রীশ্রীহরিচাঁদের এই গার্হস্থ্য দর্শনকে পাথেয় করে জাগতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিলেন শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের উত্তর সাধক তৎপুত্র শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর।''[২]

মতুয়া ভক্তদের পরিসংখ্যানগত আলোচনা করেছেন 'মতুয়া দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক সন্তোষকুমার বারুই ২০০৫ সালে। সংখ্যা ছিল চার কোটির ঊর্ধ্বে। মতুয়া ধর্মের উৎপত্তি বিকাশ ঘটেছে ধর্ম জাগরণের সময়। কিন্তু এর গভীরতার মূল শিকড় গ্রথিত রয়েছে প্রাক্-আর্যকালের সনাতন ধর্মভাবনার মধ্যে। আজকের মতুয়া ধর্মের বিস্তার রয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষে যেমন তেমনি ভাবে বলা যায় মতুয়া ধর্মাদর্শের আদর্শ পৌঁছে গেছে বিশ্বের দরবারে। ভবানী শংকর রায়ের উক্তিটিতে মতুয়া ধর্মের মানব সমাজে প্রভাবের বিস্তার পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—''আজ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়া মতুয়াদের সেই আত্মজাগরণের আত্মপ্রতিষ্ঠার আত্মমর্যাদা লাভের সেই মতুয়া ধর্মান্দোলন প্রবাহিত হয়ে চলেছে আসমুদ্র হিমাচল থেকে কন্যা কুমারিকা আন্দামান

থেকে আন্নাসাগর সমগ্র বিশ্বের দরবারে।”[৩] মতুয়া ধর্মের প্রভাব বুঝতে পারা যায় সারা ভারতের সর্বজনীন ভক্তগণের শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর শান্তিদেবীর মন্দিরের একটি অসম্পূর্ণ তালিকার মাধ্যমে। আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে মতুয়া ধর্ম যে প্রথম ভক্তির দ্বারাই প্রসারতা পেয়েছে এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের দ্বারা ভক্তি ধর্মের সঙ্গে জ্ঞানকর্মের সংযোজন হয়। বর্তমান সময়ে মতুয়া ধর্মের কার্যাবলী হয় ধর্ম কর্মাদর্শের সমন্বয়ের দ্বারা। যার প্রভাব সুদূর প্রসারী।

তথ্যসূত্র :

১. ত্রিপাঠী, অমলেশ, ইতালীর র‍্যনেশাঁস বাঙালির সংস্কৃতি, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ১৯৯৪, পৃ.

২. মণ্ডল, প্রবণব, সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের মুখপত্র, মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা, ২০১৫, ঠাকুরবাড়ি, ঠাকুরনগর, পৃ. ৩০।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।